Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 061-080
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ ঃ বাংলাদেশের ২০০১ জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন চিত্রের একটি পর্যালোচনা

লুৎফুন নাহার বেগম*
মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী**

ভূমিকা *"আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব-নব শতাব্দীতে এত নব-নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবুও আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষীছাড়া করিয়া দেয় নাই" (রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ')।*

সমাজ- রাষ্ট্র সম্পর্কে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু বছর আগেরকার বিশ্লেষণ এবং এর সাথে আমাদের চার পাশের সমকালীন বাস্তবতার এক অতি বিস্তৃত এবং তাৎপর্যপূর্ণ বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। চলমান মানবিক বিপর্যয়ের পরেও একথা কি মেনে নেয়া যায়- শাসককুল আমাদের 'ধর্ম নষ্ট করে নি'। আমাদের অন্তর্নিহিত বোধও নষ্ট হয়েছে। আমরা পশুর মত হই নি কেবল, আমরা আরো অধম হয়ে গেছি। পশুরা বোধহীন হলেও স্ব-জাতীর প্রতি একবারে মমতাহীন নয়। হিংস্র প্রাণীর নখরে এক শ্রেণীর কেউ আক্রান্ত হলে স্ব-জাতি প্রতিরোধে তেড়ে আসে। গত ২০০১ অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচন পূর্ব ও উত্তরকালের আমাদের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে বর্বর পাশবিকতা পরিচালিত হয়েছে, এবং তাতে আমাদের ভূমিকা কি প্রমাণ করে না যে- 'ধর্ম আমাদের পশুর মতো করিতে পারে নাই'।

বিশ্বের একটি দারিদ্রপীড়িত দেশ বাংলাদেশ। দীর্ঘ চার দশক অতিক্রান্ত হলেও আমাদের সরকারগুলো দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃংখলা, অর্থনৈতিক অর্জনতো দূরের কথা- সঠিক সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনেও সততার পরিচয় দিতে পারছে না। এই ব্যর্থতার ধারাবাহিকতায় অক্টোবর ২০০১ নির্বাচন পূর্ব ও উত্তরকালের সর্বগ্রাসী সহিংস নিপীড়ন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক জীবনকে কতটুকু বিপন্ন করে তুলেছে- তার একটি বিশ্লেষণাত্বক প্রয়াস এই প্রবন্ধ। যতটুকু সম্ভব

* অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
** অধ্যাপক, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে ডেপুটেশনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)-এর 'কমিশনার' হিসেবে কর্মরত)।)।

বিষয়টির একাডেমিক শৃংখলাকে গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এর বহুমাত্রিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের যুক্তিসঙ্গত মতভিন্নতা অধিকতর সমাজ নিরীক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

অনেকেই সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এ বিষয়গুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝেন না অথবা বুঝার চেষ্টা করেন না। এতে নানান রকম উদ্দেশ্য কাজ করে। আবার অনেকে ধর্ম চর্চাকে এর ভেতর টেনে এনে মিলিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। মুশকিলটা তখনই শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে ধার্মিকতা আর মৌলবাদ এক নয়। যারা নিষ্ঠার সাথে ধর্ম চর্চা করেন- জাগতিক লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে- তাঁরাইতো ধার্মিক। আর যারা সব বিষয়ে ধর্মকে অপব্যাখ্যা দিয়ে ধর্ম-ব্যবসা ও গোঁড়ামির আশ্রয় নেয় এবং হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে তারা মৌলবাদী।

- অপরপক্ষে ধর্মনিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িকতার এক নয়। তাত্ত্বিকভাবে বলা যায়, একটি সমাজে তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণের ফলে সাম্পদায়িকতা বৃদ্ধি পায় (দে, ২০০১)। এগুলো হলোঃ
- একটি সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ধ একাত্মবোধ
- অন্ধ আনুগত্য থেকে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে পার্থক্য রচনা ও অপরিবর্তনীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি এবং
- বিশ্বাসের অপরিবর্তনীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে অনিবার্যভাবে সৃষ্টি করে হানাহানি, সংঘর্ষ ও দাঙ্গা।

এসবের ফলে আধিপত্যবাদী সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্পদায়কে আত্মসমর্পনে বাধ্য করে, ধর্মান্তরিত করে, শিক্ষায় অবদমিত করে, পেশা থেকে বিতাড়িত করে, বর্ণ-বিদ্বেষী দাঙ্গায় রক্ত ঝড়ায়, দূর্বল নারীকুলকে সামাজিক নির্যাতন (ধর্ষণ) করে, সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটায়, ভাষা আক্রান্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়, জাতিগত পরাধীনতা আচ্ছন্ন করে এবং শেষতক আত্মরক্ষার্থে কোন কোন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় দেশ বা অঞ্চল ত্যাগে বাধ্য হয় (পূর্বোক্ত)। গোটা দুনিয়ার ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিপন্নতার মূলেই নিহিত এই সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ এবং এর প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য।

অক্টোবর ২০০১ এর জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক চারদলীয় জোটের নেতৃত্বদানকারী দল বি.এন.পি. সরকারের কাছে সংখ্যালঘু বলতে কি বোঝায় বা কারা সংখ্যালঘু এসবের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। আর সে কারণেই বোধ হয় তৎকালীন সরকারী দলের দায়িত্বশীল নেতারা প্রায়ই বলে থাকেন- 'এদেশে কোন সংখ্যালঘু নাই'। অতএব, সংখ্যালঘু বলতে নাগরিকদের ঠিক কোন্ অংশকে বোঝায়- তা বিশদভাবে বুঝার জন্যে বিষয়টির খোলামেলা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে '**এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায়**' বলা হয়েছে, "কোন রাষ্ট্রের কোন জনগোষ্ঠী যখন সাধারণ ঐতিহ্য, ভাষা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকে এবং কর্তৃত্বকারী জনগোষ্ঠী থেকে নিজেদের এক স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে মনে করে, তখন উক্ত কর্তৃত্ব ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বলতে তাই কেবলমাত্র সংখ্যাল্প জনগোষ্ঠীকে বোঝায় না বা নির্দেশ করে না। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে সংখ্যাল্প জনগোষ্ঠীই কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতার অধিকারী এবং সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী, অন্যদিকে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী সুযোগ-সুবিধা ও কর্তৃত্বে ক্ষমতাশালী জনগোষ্ঠী হিসাবে বাস করে। সুতরাং সংখ্যালঘুর ধারণাটি সংখ্যার উপর নয় বরং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে বিবেচিত হয়"। **জাতিসংঘের সংখ্যালঘু সুরক্ষা ও**

লুৎফুন নাহার বেগম et.al.: উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ ঃ বাংলাদেশের ২০০১ জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু ৬৩

বৈষম্য প্রতিরোধ বিষয়ক সাব-কমিশন সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কর্তৃত্বকারী ক্ষমতার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছে, "কেবলমাত্র রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর সেই কর্তৃত্ব-ক্ষমতাহীন অংশটিকেই সংখ্যালঘু বলা হয় - যারা নৃতাত্ত্বিক, ভাষা ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অন্য অংশের চাইতে বিশেষভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র"।

সঙ্গত কারণেই আমাদের দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীকে কেবলমাত্র সংখ্যাত্বক দিক থেকেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু নয়, বরং সামাজিক দিক থেকে একটি অনগ্রসর তথা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। একইভাবে পার্বত্য-চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীও জাতিগত সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃত। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ এবং পরিণতিতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুর বিপন্নতা এসব বাস্তবতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশে ২০০১ এর জাতীয় নির্বাচন পূর্ব ও উত্তরকালের সংখ্যালঘু নির্যাতন এর ধারাবাহিকতার অংশ।

ভারতবর্ষে সাম্পদায়িকতাঃ মুসলিম শাসনামল

মূঘল যুগে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অকৃত্রিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করেছিলো। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাবাদে মুসলিম শাসকরা ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা ও আচারের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা পোষণ করতো। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে সুফিবাদের বিকাশ ও ধর্ম -বর্ণের সহাবস্থান মানব কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় যদিও ভারতে নানা বিশ্বাস ও ধর্মমত ছিলো। কিন্তু সামাজিক অসাম্যই ইসলাম ধর্মের প্রসারের পথ সহজ করেছিলো বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে অরুন দাশগুপ্ত (২০০২) তার এক বিশ্লেষণে উল্লেখ করেনঃ

> "ইউরোপে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রীষ্টান ধর্ম যেরকম আগ্রাসী হয়ে উঠেছিলো এবং তার ফলে আগেকার 'প্যাগন' ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিলো - সেরকম কোন ঘটনা ভারতে ঘটেনি। ইসলাম ধর্মান্তকরণের কাজ হয়েছিলো, কিন্তু রাজশক্তির মদদে বলপ্রয়োগ করে আগেকার ধর্মগুলোকে মূলোৎপাটনের প্রয়াস ছিলো না। লক্ষণীয় বিষয় যে- মুসলমান শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কোন রাষ্ট্রশক্তি না থাকার কারণেই ভারতীয় ভূখন্ডে মুসলমানদের সাম্রাজ্য ও ধর্মবিস্তার সহজ হয়েছে। বল প্রয়োগ করে ধর্মান্তকরণ করতে গেলে হিন্দুদের মধ্যে সেই ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয় হতে পারে। এ আশংকায় মুসলিম শাসকরা বিদ্যমান সামাজিক অসাম্যকে পুঁজি করেই অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। আরো একটি কারণ হলো বহিরাগতরা (মুসলমান) এই ভূখন্ডকে স্থায়ী বসবাসের জন্যে বেছে নিয়েছিলো এবং হিন্দুদের মধ্যেও এ ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হয় যে- বহিরাগতরা এদেশের বাসিন্দা হবার জন্যেই এসেছে, এদেশেই থাকবে"।

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতাঃ বৃটিশ শাসন

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়। মূলত বৃটিশ শাসকরাই তাদের শাসনব্যবস্থাকে নিস্কন্টক রাখার জন্যে সুকৌশলে হিন্দু ও মুসলমানদের সংস্কৃতিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ ও প্রচার করে। এই প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে মদদ দিয়েছিলো বড়লাট ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, যদিও হিন্দুদের মাঝে অনেক নেতাও অল্পাধীক দায়ী ছিলেন"।

এভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতার নামে হিন্দু ধর্মীয় পূনরুত্থানবাদের উন্মেষ ঘটে। যার উত্তরসুরী হিসাবে শিবসেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি কট্টর হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠীর সম্মিলিত রাজনৈতিক প-াটফরম ২০০২ সালের ক্ষমতাসীন বিজেপি। হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাগরণের কোন এক পর্যায়ে ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম হয় (১৯০৬) এবং ১৯৪০ সনে জিন্নাহর নেতৃত্বে লাহোর প্রস্তাবে (পাকিস্থান প্রস্তাব) দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। শেষ মুহুর্তেও জিন্নাহ তাঁর অবস্থান পরিবর্তন না করায় ধর্মের ভিত্তিতে দুইটি আলাদা রাষ্ট্রের বিভাজন অনেকটা অনিবার্য হয়ে উঠে। সেই অর্থে পাকিস্থানী রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা (জনক) জিন্নাহকে ধর্মনিরপেক্ষতার মাপকাঠিতে মূল্যায়নের সুযোগ নেই। একই প্রেক্ষাপটে গান্ধিজিকে অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকে নেতাজীর (সুভাষ বসু) প্রতি সুবিচার করেন নি। সত্যিকার অর্থে নেতাজীর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ' যদি বিপর্যয় এড়াতে পারতো তাহলে ভারতের রাজনীতির ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো।

ঘটনা পরিক্রমায় ১৯৪৬ সনে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূচনা হয়। এর সূত্র ধরেই ১৯৪৭-এ উপমহাদশে ধর্মীয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয়, যে রাষ্ট্রে বর্তমানে 'ব-াসফেমী' আইন চালু আছে। একই সূত্রে ভারত রাষ্ট্রে আবির্ভাব ঘটেছে হিন্দু মৌলবাদের, যদিও স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মৌলিক চেতনা হিসাবে স্থান দেয়া হয়েছে শুরু থেকেই। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য বামদলগুলো সেক্যুলার/ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুসারী হলেও ২০০২ সনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) প্রকৃত অর্থে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো গোঁড়া ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সাম্প্রদায়িক আকাঙ্খাকে মূল্য দিতে গিয়ে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদের স্থলে রাম মন্দির নির্মাণের ইতিহাস কার না জানা। কাশ্মিরের প্রাত্যহিক সহিংসতা ছাড়াও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও অখন্ডতার প্রতি আরও একটি চ্যালেঞ্জ তৎকালীন ক্ষমতাসীন বি.জে.পি সময়কার গুজরাটের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতিঃ পাকিস্তানী আমল

'৪৭-এর চেতনায় তথা দ্বি-জাতি তত্ত্ব বা ধর্মভিত্তিক চেতনা নিয়ে যে রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) জন্ম - সেই রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের শোষণ ও নির্যাতনের বীজ তো স্বয়ং রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। হাসান আজিজুল হক (সংবাদ, ২০০১) তাঁর এক প্রবন্ধে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে পঞ্চাশ-ষাট দশকের 'এনিমি প্রপার্টি', 'ইভ্যাকুই প্রপার্টি'-আইনের ভয়াবহতার দিকটি উল্লেখ করেন।

এই সময়ে বাংলাদেশের বিশাল গ্রাম এলাকাজুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কত পরিবার যে সর্বস্বান্ত হয়েছিলো, কত পরিবার যে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো তার হিসাব কোনদিন হয়নি, হবেও না। কি নীরব নিষ্ঠুর কুৎসিত ঘটনা যে এখানে ঘটে গিয়েছিলো তার পুরো ইতিহাস কোনদিনই আমাদের জানা হবে না। তবে বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘু একটি পরিবারও কোনো না কোনভাবে এর আওতার বাইরে থাকতে পারেনি একথা বললে বোধ হয় খুব বেশী বলা হবে না।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজেদের প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য করার রেওয়াজ এ-দেশে প্রথম চালু হয় পাকিস্তানী শাসনামলে। ফয়েজ আহমদ তাঁর এক নিবন্ধে (যুগান্তর, ২০০১) উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তান আমল থেকেই এই বাংলাদেশ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাতের চেষ্টা করতো স্বয়ং সরকারই। দেশ বিভাগের পর

লুৎফুন নাহার বেগম et.al.: উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ ঃ বাংলাদেশের ২০০১ জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু ৬৫

'৪৮ ও '৫০ এর দাঙ্গায় সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রের সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলো। মুসলিম লীগও হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় কোনো ভূমিকা রাখেনি। সেই ক্ষত নিয়ে '৫৪ সালের নির্বাচনে এ দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পাকিস্তানের তথাকথিত 'সংহতি ও তমদ্দুন'- এর জন্যে ক্ষতিকারক বলে গণ্য করা হয়। এটি তারা যতোটা না নিজেদের বিশ্বাস থেকে করতো, তার চেয়ে অনেক বেশী করতো নিজেদের দক্ষতাকে টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসাবে। ভাষাকেন্দ্রিক জটিলতার ধুয়া তুলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) বাংলা ভাষাবাসী লোকদের (সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের) 'হিন্দুয়ানী'- ভাষার তল্পীবাহক বলে অভিযোগ করা হতো। বিশেষ করে এ অঞ্চলের হিন্দুদেরকে পাকিস্তানী রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে বিবেচনা করা হতো। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী জাতিরা বাংলা ভাষার লড়াইকে ক্রমাগত শাণিত করতে গিয়ে ভাষাভিত্তিক এই আন্দোলন - স্বাধীকারের আন্দোলন ছাড়িয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপ নেয়। আর তারই পরিণতিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে এদেশের জনগণ যখন একটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে গণরায় ঘোষণা করে, তখন ঐ শাসকবর্গ আওয়ামী লীগকে সমর্থনকারী পুরো জনগোষ্ঠীকে অমুসলিম আখ্যা দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে তাদের বর্বর সশস্ত্র বাহিনীকে এখানকার সাধারণ মানুষের উপর লেলিয়ে দেয়। অনিবার্য হয়ে ওঠে '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ। ধর্মের অজুহাতে স্বাধীনতা বিরোধী তৎকালীন জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীরা তখনো বেছে নিয়েছিলো নারী নির্যাতনকে। ঐ সময় পাক বাহিনীকে সমর্থনকারী এদেশের মুষ্টিমেয় দালাল, রাজাকার, আলবদর আর আলশাম্‌স্‌দের সকলেই ছিলো তাদের কাছে সাচ্চা মুসলমান। আর তারাই পাকিস্তান রক্ষার জন্যে পাক বাহিনীকে সহায়তা করতো সাধারণ বাঙ্গালীদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে, খুন ধর্ষণ চালাতে। এই মুসলমানদেরই একজন শর্ষীণার পীর মাওলানা আবু জাফর যিনি ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী নারীদেরকে 'মালে গনিমত'- আখ্যা দিয়ে তাদেরকে ভোগ করা পাকিস্তানী সৈন্যদের জন্যে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন (খান, ২০০১)। শেষতক হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এর ঐক্যবদ্ধ মিলিত সংগ্রামে মৌলবাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক সেক্যুলার রাষ্ট্রের জন্ম হলো- বাংলাদেশ। কিন্তু এটা (সেক্যুলারিজম) বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। নতুন রাষ্ট্রের অস্থিরতা, ব্যাপক সহিংসতা মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবেই সহিংসতার জন্ম দিয়েছিলো স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠী এবং কোন কোন আন্তর্জাতিক মহল (কার্জন, ২০০১)।

জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান নামে এদেশটিতে গণতান্ত্রিক শাসন দু'চার বছরের বেশী ছিল না বললেই চলে। বর্তমানে এদেশটিকে একটি উগ্র জঙ্গী রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ তালিকাভূক্ত করেছে। ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনায় পাকিস্তানী সমাজ - রাষ্ট্রের মানবিক মূল্যবোধ কতটুকু বিপর্যস্ত তা দু'একটি ধর্মান্ধ গোঁড়ামির উল্লেখ করতে গিয়ে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে (জনকণ্ঠ, ২১ জুলাই ২০০২) জানা গেছে 'মুখতারান বিবি' নামে এক উপজাতীয় পরিবার পাকিস্তানে পঞ্চায়েতের রায়ে শাস্তিমূলক গ্যাংরেপের শিকার হয়েছেন! পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশনের হিসাবে শুধু পাঞ্জাব প্রদেশে ২০০২ সালের প্রথম ছয় মাসে ৭২টি গ্যাংরেপ হয়েছে। অন্যান্য ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯৩টি। ধর্ষণকারীরা প্রায় ধনী ও উচুঁ বংশের আর ধর্ষীতারা সাধারণত গরীব পরিবারের মহিলা। একই তথ্যসূত্রে জানা গেছে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ থেকে সে সময়ে পাকিস্তানের একটি আদালতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তির পূনর্বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে পাঞ্জাবের একটি পঞ্চায়েতে। রায় অনুযায়ী একদিন পর ২৫০ থেকে ৩০০ লোক পাথর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ও পরিণতি ঃ স্বাধীনতোত্তর কাল (১৯৭২-১৯৭৫)ঃ আওয়ামীলীগ শাসনামল

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে অসাম্প্রদায়িক সেক্যুলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আস্থা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পূর্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান '৬৪ এর দাঙ্গা দমনে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান, ধর্ম পালন ও অধিকার আদায়ের জন্যে আওয়ামীলীগ সরকার রাষ্ট্রের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-কে স্থান দিয়ে এর সার্বজনীন সেক্যুলার চরিত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানবাধিকারের বিষয়টিও সুরক্ষিত হয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি রাষ্ট্রের সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে সরকার স্বাধীনতা বিরোধীদের (যুদ্ধাপরাধী ছাড়া) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। অতি অল্প সময়ে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগ-এর অসাম্প্রদায়িক নীতির প্রতি আস্থা স্থাপনে উৎসাহী হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় '৭৫ এর নৃশংস হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে জাতির জনকের স্ব-পরিবারে মৃত্যু ও ক্ষমতার পটপরিবর্তনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটে - ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তহীনতা প্রকটভাবে প্রতীয়মান হয়। সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ছাড়াও এই সহিংস ঘটনার জন্যে অনেকে আওয়ামী লীগ সরকারের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহিংসা পরায়ণতাকেও দায়ী করেন। মৌলবাদীদের নিরন্তর আস্ফালনের এই সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রের মৌল সেক্যুলার চেতনা অক্ষুণ্ন থেকেছে। কিন্তু যা ঘটার তাই ঘটেছে '৭৫ এর মানবতাবিরোধী বিয়োগান্ত ঘটনার পর। কোনভাবে রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে অক্ষুণ্ন রাখা যায়নি।

বি.এন.পি- এর শাসনামল-১ (১৯৭৬ - ১৯৮১)

'৭৫ এর পরবর্তীকালের রক্ষণশীল মুসলিম লীগ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের সমন্বয়ে জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। সামরিক সরকার জেনারেল জিয়া ধর্ম-নিরপেক্ষতার চেতনায় কুঠারাঘাত করলেন পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে এটাকে বাদ দিয়ে। শুধু তাই নয়। মহান বাংলাদেশের সংবিধানে যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, দল ও এর চর্চা নিষিদ্ধ ছিলো মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়া এটিকেও পদদলিত করলেন। এতে করে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগের মতো স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মকেন্দ্রিক দলগুলো রাজনীতি করার সুযোগ পেলো। জিয়ার সাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদী চরিত্রের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছিলো বলে অনেকে মনে করেন। স্বাধীনতা বিরোধীদের পূনর্বাসন প্রকল্পের অংশ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হয়েও তিনি রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ সমূহে রাজাকারদের প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরো জিয়ার শাসনামলেই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর অপতৎপরতায় এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চরমভাবে লঙ্ঘিত হওয়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী দলগুলোর সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। এখানে এটি বলা প্রয়োজন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। কিছু ধর্মান্ধ ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিকে ধর্মহীনতা এবং ইসলাম বিরোধী বলে অপপ্রচার করে। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ দাঁড়ায় সকল ধর্মের মানুষ- যে যার ধর্ম পালনে কোনো বাধার সম্মুখীন না হওয়া। এটিকে অন্যভাবে অপব্যাখ্যা কোনো মতে প্রাসঙ্গিক নয়।

জাতীয় পার্টির (এরশাদ) শাসনামল (১৯৮১ - ১৯৯০)

জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষমতার পালাবদল ঘটালেন আরেক সেনা শাসক জেনারেল এরশাদ। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে বীজ জিয়া বপন করে গেছেন - তাঁর অনুসারী এরশাদ তাতে নতুন মাত্রা যোগ করলেন নানা ভাবে। তিনি 'ইসলামকে' রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করেন। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে এটাকে সংবিধানে সংযোজন করেন। এতে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের বহুমাত্রিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ধর্মভিত্তিক অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোও এরশাদের এই ছলচাতুরীকে নিছক তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের কৌশল বলে মনে করতেন। এভাবেই সংবিধানে জাতীয় মৌল ঐক্যের চেতনা- ধর্মীয় উম্মাদনার বাড়াবাড়িতে একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে। একারণেই আজ আমরা মুসলিম সংখ্যাগুরু, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সংখ্যালঘু। রাজনীতিতে এরশাদ খুবই চতুর প্রকৃতির লোক হিসাবে সমধিক পরিচিত। রাজনীতির আনুকুল্য লাভে এই লোকটি মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দিতে কার্পণ্য করতেন না। মসজিদ-মক্তবে গিয়ে মুসল্লিদের সহানুভূতি লাভে নানান ফন্দি-ফিকির করতেন। অনেক সময় মিথ্যা বলার সাথে কান্নাও জুড়ে দিতেন। নব্বইয়ের শেষ দিকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যখন তাঁর গদি টলটলায়মান, সাম্প্রদায়িক উস্কানী সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকার শেষ অবলম্বন হিসাবে তিনি সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তার পরও শেষ রক্ষা হয়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে সেই সহিংসতার পেছনে স্বৈরাচারী শাসকের স্বার্থবুদ্ধিজাত কুটচিন্তা সক্রিয় ছিলো (সিদ্দিকী, ২০০১)।

বি.এন.পি-এর শাসনামল-২ (১৯৯১ - ১৯৯৫)

এ সময়ে বি.এন.পি. স্বাধীনতা বিরোধীদের পূনর্বাসন প্রকল্প নতুন করে হাতে নেয়। গোলাম আযম সময়ের সুযোগে স্ব-মুর্তিতে আবির্ভূত হন এবং এক পর্যায়ে নাগরিকত্ব লাভ করেন। জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশে ফতোয়া ও মোল্লাদের অনুশাসনের দাবি জোরদার হতে থাকে। ১৯৯১ সালের জুন থেকে আগষ্ট মাসে ৫২টি সংঘর্ষে ৯ জন ছাত্রের প্রাণহানী ও ১০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র সহিংসতার কারণে বন্ধ হয়ে যায় (পারভেজ, ১৯৯১)। জামায়াতে ইসলামীর স্টুডেন্ট ফ্রন্ট ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্র দলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলদারিত্বের কারণে এ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। মৌলবাদী দলগুলোর অন্ধ ধর্মীয় উম্মাদনার চরম পর্যায়ে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে থাকে। যদিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন এদেশে নতুন নয়। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে এদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ভয়াবহতা নানানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর (১৯৯২) এখানে যা ঘটেছিলো তা অকল্পনীয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো বর্বর সরকারের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এহেন সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী কাজ কেবল সমাজের অধঃগতিকেই ত্বরান্বিত করবে (হক, ২০০১)।

আওয়ামী লীগ শাসনামল (১৯৯৬ - ২০০১)

বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান এবং তৎপরবর্তী চর্চা এখন অর্জনে পরিণত হয়েছে। '৭৫ পরবর্তী শাসনকালের সময় থেকে অদ্যাবধি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বর্তমান শাসনকাল ব্যতিত মাত্র এক বার (১৯৯৬-২০০১) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবার সুযোগ পেয়েছিলো। যদিও রাষ্ট্রকে তার পূর্বেকার নিরপেক্ষ চরিত্রে

ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতা দলটির ছিলো না। কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালীন দলটির শাসকরা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর আস্ফালনে যেভাবে নিস্পৃহ-নির্লিপ্ততা দেখিয়েছে- এতে আওয়ামী লীগের কি লাভ হয়েছে জানিনা, তবে এদেশের অসাম্প্রদায়িক মানুষগুলোর (বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) স্বাভাবিক জীবন যাত্রার স্বপ্ন সৌধ চুরমার হয়ে গেছে। ২০০১ অক্টোবর নির্বাচন পূর্ব এবং উত্তরকালের সহিংস উম্মাদনা এরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অথচ '৯৬ নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ছিলো শহীদ জননী জাহানারা ইমামের (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান) চেতনায় স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার। আওয়ামী লীগ (শাসক দল) সে অঙ্গীকার রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় জাহানারা ইমামের জীবনকালীন সারা দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যেভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলো- ঠিক তাঁর অবর্তমানে বিপরীতক্রমেই এটির ভাটা পড়েছে। পরিণতিতে গত অক্টোবর ২০০১ নির্বাচনপূর্ব থেকে নির্বাচনোত্তর এবং জোট সরকারের পুরো শাসনকালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সন্ত্রাস এবং সহিংসতায় বিরোধী নেতা-কর্মীরা বিশেষভাবে সংঘ্যালঘু নারী-শিশুরা যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে - তাতে আওয়ামী লীগের বিশেষ কোন নেতা-কর্মীকে প্রতিরোধ তো দুরের কথা প্রতিবাদের জন্যও পাওয়া যায়নি। একটা অসহায় ভীতিকর পরিবেশে গণধর্ষণের মতো ঘটনাকেও চাপিয়ে যেতে হয়েছে। প্রগতিশীল দলীয় নেতা-কর্মীদের এতো উদাসীনতা ইতোপূর্বে কখনো চোখে পড়েনি।

অভিযোগ আছে যে, ক্ষমতায় যাবার আগে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক তৎপরতা আওয়ামী লীগের দীর্ঘকালের লালিত রাজনৈতিক দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলনা। যদিও এ তৎপরতা কেবল তৎকালীন সরকার বিরোধী আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিলো। আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিপদ হলো এটাই- তারা মাঝে-মধ্যে দূরত্বটা কমিয়ে ফেলে। এতদসত্ত্বেও আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদের শাসনামলে সংখ্যালঘূদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় শান্তিভঙ্গের তেমন কোনো আশংকার সৃষ্টি হয়নি। এরশাদ এবং বি.এন.পি.-এর শাসনামলে পাকিস্তানের অনুকরণে (যেহেতু বাংলাদেশে পাকিস্তানী মডেলে মধ্যযুগীয় ধর্ম-রাষ্ট্রের ছায়া বিরাজ করছে এবং ক্রমেই সেদিকে যাত্রা শুরু করেছে বলে অনেকের মতো আমরাও মনে করি) শুরু হয়েছিলো আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন। আওয়ামী লীগ শাসনামলে সরকারের উদার ও সতর্ক নীতির কারণে আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন তেমন জোরদার হয়নি। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিতাড়নের প্রেক্ষাপটে সংখ্যায় অতি অল্প এই বর্ণগত মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আমিনী-সাঈদী গং পুনরায় জেহাদী-যোশে যুদ্ধ শুরু করার আতংকে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়টি খুবই ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো। 'অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি'- আইন বাতিলের গড়িমসি ও কালক্ষেপণে আওয়ামী লীগ তাদের নীতি-আদর্শের প্রতি সুবিচার করেনি। এটি দলের স্বার্থবাজ কিছু নেতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কারণ বলে অভিযোগ আছে। দেরিতে হলেও শেষমেষ এটি বাতিল করা হয়েছে। তড়িঘড়ি করে বাতিলের ফলে সংখ্যালঘুদের খুব একটা ভাগ্যের পরিবর্তন আসবে বলে মনে হয় না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার (লতিফুর) শাসনামলঃ ২০০১

বিচারপতি লতিফুর রহমানের দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই অনেকের কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে (সংবাদ মাধ্যম) তিনি একজন লোভাতুর প্রকৃতির মানুষ। মেধা-মননে অতি সাম্প্রদায়িক। প্রধান উপদেষ্টার মতো একটি সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের যে মর্যাদা ও ভাবমূর্তি তার সঙ্গে তাঁকে খুব বেমানান মনে হয়েছে। তিনি নিজেও এ পদের প্রতি খুব একটা দায়িত্বশীল ছিলেন বলে মনে হয়নি, যতটা আগ্রহী

ছিলেন এ পদের জন্যে। তাঁর ধারণায় থাকা উচিত ছিল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের অর্জন। কারো দয়া কিংবা আনুগত্য নয়। তিনি ক্ষমতা নিয়েই প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় পদগুলোতে দক্ষ, সৎ মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের সরিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী তথা মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধীতাকারী রাজাকার, আল-বদর ও তাদের সহযোগীদের পূনর্বাসিত করেন। এটি চূড়ান্তভাবেই স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠীকে (চার দলীয় জোট) ক্ষমতারোহনে তাঁর নীল-নক্সার বাস্তবায়ন। নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নির্বাচনী কাজে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বহুবিধ জায়গায় স্বপ্রণোদিত হয়েই তিনি স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী গোষ্ঠীর অনেককেই অধিষ্ঠিত করেছেন। এটিও স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ ও লাঞ্ছিত মা-বোন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তিরস্কারের শামিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাব উদ্দিন হয়তো কোথাও এসবের নীরব সাক্ষী, নয়তো দুস্কর্মের অংশীদার।

সমাজে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, সংখ্যালঘুরা আওয়ামী সমর্থক। ২০০১ অক্টোবরের নির্বাচনের পূর্বে সে কারণে সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হুমকি-ধামকি দেয়া হয়েছিলো। বলা হয়েছে ভোট কেন্দ্রে গেলে হত্যা করা হবে, না হলে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কাউকে বাংলাদেশে থাকতে দেয়া হবে না। নির্বাচনের প্রাক্কালে সেনা-বিডিআর এর যৌথ গুলিবর্ষণ/নির্যাতনে সারা দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে/সমর্থন করলে তাদের পরিণতি এমনই হবে। বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী, মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সহায়তায় সংখ্যালঘুদের ঘর-বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে তাদের মাঝে এমন ভীতিকর ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগকে সমর্থন করলে এর ভয়াবহতার মাত্রা আরো বেড়ে যাবে। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে যে, বাংলাদেশে মোট ভোটারের মধ্যে প্রায় ৮৫ লাখ ছিল সংখ্যালঘু ভোটার। এদের মধ্যে ৪০ লাখ ভোটার দু'হাজার এক নির্বাচন পূর্ব এবং উত্তর কালের সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছে। দেশ জুড়ে সংঘটিত নারকীয় সন্ত্রাস ও সহিংসতা গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত ধ্বসিয়ে দিয়েছে। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়ায় চলেছে হত্যা, আক্রমণ-নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, সহায় সম্পদ জবর দখল ও লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ ও দেশ ত্যাগের হুমকি প্রদানের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ কার্যক্রম। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন ও পুলিশের উপস্থিতিতে এসব অপরাধ সংঘটিত হওয়ায় চরম নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়বোধ গ্রাস করেছে সাধারণ মানুষকে। রাষ্ট্রপতির অস্বাভাবিক নীরবতায় উৎসাহিত হয়েছে পরিকল্পিত সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীরা। অথচ লতিফুরের তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ ছিলো। অনেকের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই সাময়িক কালটিই জাতির ইতিহাসে একটি জঘন্যতম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির আগ্রাসী উত্থান হিসাবে বিবেচিত হবে।

এতো অল্প সময়ে সন্ত্রাস, সহিংসতার যে অমানবিক মূল্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দিতে হয়েছে-তার বিভৎসতা নির্বাচনের আগে দেশের জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে সচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এক কথায় এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশকে একাত্তরের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া। বস্তুতঃ এ কাজে তাঁরা অনেকটা সফলও হয়েছেন।

বি.এন.পি-এর শাসনামল-৩ (২০০১ - ২০০৬)

ক্ষমতাসীন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি.এন.পি. একটি অতি-উগ্র মৌলবাদী (ইসলামপন্থী) দলে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলে সমমনা ইসলামী ভাবাপন্ন দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে চার দলীয় ঐক্যজোট। জন্মলগ্ন থেকে বি.এন.পি-এর রাজনৈতিক দর্শন সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়নি।

একারণেই দলটির ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা ক্রমশ শক্তির সঞ্চার করতে সমর্থ হয়। কালের ধারাবাহিকতায় সে সময়ে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবে সংখ্যালঘুরা এদের শাসনামলে নানাভাবে নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। এই ঘৃণ্য নির্যাতন, প্রাণঘাতী অত্যাচার - বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ার মানবিক অঙ্গীকারকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এভাবেই সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশ বিভাগের পর থেকেই বরাবর চেষ্টা করে আসছে বাংলাদেশকে সংখ্যালঘুমুক্ত মনোলিথিক ইসলামী জনগণের দেশে রূপান্তরিত করতে (রায়, ২০০১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আইনের এক তরুণ শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জন ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১ 'দৈনিক সংবাদে'-একটি উপসম্পাদকীতে তাঁর লেখায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন- সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতিত হলে এ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে কি না? কার্জন অত্যন্ত অপটিমিস্টিক বলেই হয়তো এখনো রাষ্ট্রের সেক্যুলার চরিত্র নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেও আশাহত হননি। সত্যিকার অর্থে বাস্তবতা কি তাই? রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িকতার সাংবিধানিক চেতনাতো অনেক আগেই বিলীন হয়েছে, বিশেষ করে সংবিধানের পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে যথাক্রমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম করার কারণে (যদিও সাম্প্রতিক সময়ে পঞ্চম সংশোধনী সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বাতিল করা হয়েছে)। এই রাষ্ট্রে ইসলাম বিরুদ্ধবাদীরাতো (মুসলিম বাদে অন্যান্য সম্প্রদায়) সংখ্যালঘু। তাই রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতাকে সুসংহত রাখার জন্যে সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন প্রয়োজন। চারদলীয় জোট মৌলবাদী জামায়াতের সহায়তায় এ কাজটিকেই আরাধ্য মনে করে এখনও।

আগাগোড়াই বি.এন.পি. ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করে আসছে। নির্বাচন এলে এ দলটি প্রচারণায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণের ক্ষেত্রে অবাস্তব সাম্প্রদায়িকতার ধুঁয়া তোলে। আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে মসজিদে আযান বন্ধ হয়ে যাবে, দেশে হিন্দুয়ানী কায়েম হবে- এরকম অন্তঃসারশুন্য বক্তব্য দিয়ে শুধু ক্ষান্ত হয়নি, কোথাও কোথাও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মীরজাফর! বলতেও দ্বিধা করেনি (পত্রিকা সূত্র)। তাদের ভাষায় শেখ মুজিব মীরজাফর, কারণ নাকি তিনি 'ইসলাম'-কে নির্বাসনে পাঠিয়ে সংবিধানে নিরপেক্ষতা টেনে এনেছেন। যে দলটির নির্বাচনী প্রচারণায় এবং নেত্রীর ভাষণে এরকম সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সে দলটিকে আপাদমস্তক একটি ধর্মান্ধ-সুযোগ সন্ধানী দল বললে খুব বেশী বলা হবে না। উপরন্তু, এ দলটির জন্মগত চরিত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামীর কারণে তারা হিন্দু সম্প্রদায়কে ইসলামের শত্রু এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে বিবেচনা করে।

সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার যে ভূত তৎকালীন বি.এন.পি. সরকারের কাঁধে চেপেছে - তাকে কোনোভাবে আর নামানো যায়নি বলে নির্বাচনোত্তর সারাদেশে এমন এক ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যে- নির্যাতিতরা ভয়ে মুখ খুলতেও সাহস পায় না। প্রতিকারের আশায় থানায় অভিযোগ করতে গিয়ে অনেকে হয়রানির শিকার হয়েছেন। উল্টো তাঁদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়ানোর মাধ্যমে নতুন আতংক ছড়ানো হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা গেছে- ধর্ষিতারা থানায় গেলে পুলিশ প্রশাসন থেকে বলা হয় - "চেপে যান, এরকম দু'একটা ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়"! কি অবাক দেশে আছি আমরা? ধর্ষণের মতো একটি জঘন্য স্পর্শকাতর বিষয়েও ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারি না। কিছু ব্যতিক্রম বাদে, থানা-পুলিশের চরিত্রতো সবারই জানা। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে একটি কথা বের হয়ে এসেছে যে, সে সময় চার দলীয় জোটের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কারণে ক্ষমতাসীন সরকার কখন কোন কাজটি করতে হবে- সেই হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। এতে তারা মনে করে এবং কেউ কেউ দাবিও করে-জনগণ তাদের এসব করার (সংখ্যালঘু নির্যাতন) ম্যান্ডেট দিয়েছে। বুদ্ধি-চিন্তায় স্থুল এ-জাতীয় মানসিকতায় রাষ্ট্র প্রশাসন পরিচালিত করতে গিয়ে শাসকদলের

লুৎফুন নাহার বেগম et.al.: উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ ঃ বাংলাদেশের ২০০১ জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু ৭১

নির্বিচার প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। সভ্যতার বিবেকবর্জিত অত্যাচার, নির্যাতন এবং সহিংসতার দ্রোহে অমানবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘুদের উপর হামলা একাত্তরের ভয়াবহতাকেও ম্লান করে দিয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর নেমে এসেছে অভাবনীয় তান্ডব। মনে হচ্ছে দেশে একটা দুবৃত্তের মহা উৎসব চলছে। পঞ্চাশ বৎসর বা তদূর্ধ নারী থেকে শুরু করে সাত বছরের শিশু - এমন কি মানসিক প্রতিবন্ধি ও গর্ভবতী নারীরাও ব্যাপক গণধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। Amnesty International তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে- একশ'রও বেশী সংখ্যালঘু নারী ধর্ষিত হয়েছে বি.এন.পি. এবং জামায়াত জোটের সন্ত্রাসীদের দ্বারা (লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর ২০০১)। ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ নিরীহ জনগণ তাদের ধনসম্পদ, জীবন-ইজ্জত সব হারিয়ে ভাসমান জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। অনেকে দেশ ত্যাগও করেছে। দেশব্যাপী পরিচালিত এই কাপুরুষিত জঘন্যতম নির্যাতনে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কতটুকু অমানবিক মূল্য দিতে হয়েছে তা সারণী-১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

মানব অত্যাচারের এই সীমাহীন দূর্যোগের মধ্যেও শাসক দলটি ছিলো নির্বিকার। সন্ত্রাসের বলগাহীন লাগামকে নিয়ন্ত্রণের কোনো কর্ম-চিন্তা তারা ভেবে দেখেনি। ভীত সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘুদের অনেকে ভয়ে মুখ খুলতে চায়নি-থানায় মামলা করা তো দূরের কথা। "উপরের নির্দেশ আছে"-বলে থানা পুলিশ নির্যাতিত অনেকের কাছ থেকে মামলা নেয়নি। সারণী-২ এ বিষয়টিকে সংখ্যাত্বক বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে।

সারণী ১ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন চিত্র
(অক্টোবর ২০০১ থেকে জানুয়ারি ২০০২)

১	অর্ষণ	২৮৪ জন
২	অপহরণ	৪৬ জন
৩	জোর-পূর্বক গৃহ থেকে বিতাড়িত	৩৮,৫২১ পরিবার
৪	হত্যা	৩৮ জন
৫	মৃত্যুর আশঙ্কা	৮০৬ জন
৬	শারীরিক নির্যাতন (পুরুষ)	২,২৬১ জন
৭	শারীরিক নির্যাতন (নারী)	১,৪৯৬ জন
৮	বাড়ী ঘর ও ব্যবসা কেন্দ্র লুণ্ঠন	২,৮০০ টি
৯	অগ্নিসংযোগ	১,৮৬৩ টি গৃহ
১০	পূজা-মন্ডপ আক্রমণ	১০১টি
১১	চাঁদা-বখরা দাবি	১,৯২,৪৭,৫০০/= টাকা
১২	লুট	৩,৪৯,৮৫,০০০/= টাকা
১৩	ঋয়-ভীতি ও আক্রমণ (পুরুষ)	৬৯০ জন
১৪	বিবস্ত্র করা (নারী)	১৮ জন

সূত্রঃ সমকালীন জাতীয় সংবাদ মাধ্যম ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ জাতীয় কনভেনশন, ২০০২।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ২০০১ নির্বাচনকেন্দ্রিক ৬২৯টি সহিংস ঘটনার মধ্যে ৯৮টি ঘটনায় গ্রেফতার করেছে ২০২ জন এবং অবশিষ্ট ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। তবে কিছু ঘটনায় ৩০ জনকে গ্রেফতারের পর পুলিশ অজ্ঞাত কারণে ছেড়ে দেয়। অথচ সংখ্যালঘুদের অত্যাচার-নির্যাতনের তথ্য-চিত্র সংগ্রহের চেষ্টা করায় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবিরকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করে নির্যাতন করেছে সরকার। শাহরিয়ার কবির মৌলবাদীদের জিঘাংসার শিকার। কারণ তিনি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতা।

সারণী ২ঃ নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংস ঘটনায় মামলা দায়ের ও গ্রেফতারের খতিয়ান

মামলা দায়ের করা হয়েছে এমন সংখ্যা	মামলা দায়ের করা হয়নি এমন ঘটনার সংখ্যা	গ্রেফতারকৃতদেও সংখ্যা	গ্রেফতারের পর ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা
১২৮	৫০১	২০২	৩০

সূত্রঃ উর্মি, ২০০২।

২০০১ নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার ধারাবাহিক চক্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। একাত্তরের পরাজিত সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলগুলো মনে করে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটা বড় শক্তি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা (শতকরা ১০ ভাগ)। নির্বাচনের সময় এরা যে দলকেই ভোট দিক, মূলত এরা সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পক্ষে। এদের বিতাড়ন করা না গেলে বাংলাদেশকে কখনোই একটি মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না (চৌধুরী, ২০০১)। ষড়যন্ত্রমূলক এই বিতাড়ন প্রকল্পের জের হিসাবে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর হার ক্রমাগত কমছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের কারণে দেশ ত্যাগের ঘটনা এর অন্যতম কারণ বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে। সারণী-৩ থেকে এ বিষয়টির ধারণা পাওয়া যাবে।

নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত যে সব হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ঢুকেছে, তাদের সংখ্যা পনেরো হাজারের বেশী হবে (পূর্বোক্ত)। যদিও এই সংখ্যা আরো বেশী বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্র দাবি করে। দেশকে হিন্দুশুন্য করার এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দশকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ২০০১-এর হারের অর্ধেকে নেমে আসবে বলে মনে হয়। জাতিগত সংখ্যালঘুদের অবস্থাও প্রায় একই। পার্বত্য-চট্টগ্রামে যেখানে শতকরা ৯৮ ভাগ পাহাড়ী (উপজাতি) জনগণ ছিলো, সেখানে এখন পাহাড়ী-বাঙ্গালী অনুপাত ৫৫.৪৫ (একই তথ্য সূত্র)।

সারণী ৩ ঃ বিভিন্ন সময়ে দেশে বসবাসরত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা

সময়কাল	সংখ্যালঘুর হার (%)
১৯৫১	২৩.১
১৯৬১	১৯.৬
১৯৭৪	১৪.৬
১৯৮১	১৩.৪
১৯৯১	১১.০
২০০১	১০.০

সূত্রঃ চৌধূরী, ২০০১ এবং দে, ২০০২।

সংখ্যালঘু নির্যাতনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

মৌলবাদী জোট সরকার তার হীন-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 'মাইনরিটি ক্লিনজিং'-এর নামে যে পাশবিকতায় মেতে উঠেছে তার প্রতিবাদে এদেশের মানবাধিকার সংগঠন, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, সামাজিক সংগঠন এবং নাগরিক সংগঠনগুলো দৃশ্যতই নির্বিকার ছিলো। অথচ সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ আন্দোলন, মশা নিধন/ডেঙ্গু সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে কতই না ঢাকঢোল পিটানো হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনেকের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থনের কারণে হেনস্থা হওয়ার আশংকার (অযথা হয়রানি ও গ্রেফতার আতংক) এসব প্রতিরোধে কেউ সাহসের সাথে এগিয়ে আসেনি। সবচেয়ে যে বিষয়টি অবাক করেছে- সেটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা। নিতান্ত দায়-সারা গোছের কিছু তত্ত-তালাশ ছাড়া তেমন কিছু চোখে পড়েনি। ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত সাতটি দেশের কুটনীতিকগণ ১৮ অক্টোবর ২০০১ তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অধ্যাপক এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী (যিনি পরে রাষ্ট্রপতি হয়ে সাড়ে পাঁচ মাসের মাথায় পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন)-এর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কুটনীতিকগণ বলেন, নির্বাচন শেষ হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের উপর সরকারী দলের সমর্থকদের হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। কুটনীতিকগণ সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সরকারী দলের সমর্থকদের ক্রমবর্ধমান চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী ঘটনার কথাও তুলে ধরেন (যুগান্তর, ২০০১)।

ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স (ফেমা) নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপর তাদের প্রকাশিত (১৯ অক্টোবর ২০০১) প্রতিবেদনে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, গৃহে অগ্নিসংযোগ, মালপত্র ছিনিয়ে নেয়ার কথা প্রকাশ করেছে। মিডিয়া অ্যালায়েন্স ফর ইলেকশন মনিটরিং ইন বাংলাদেশ (এমএইএম) "সাংবাদিকদের চোখে নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি"-শীর্ষক এক প্রতিবেদনে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সহিংসতায় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করেছে (১৯ অক্টোবর, ২০০১)। অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট (ভোট) নির্বাচনোত্তর সরেজমিনে তদন্ত শেষে তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন- নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে সারা দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর নৃশংস অত্যাচার ১৯৭১ সালের পর আর দেখা যায়নি (২০ অক্টোবর, ২০০১)।

সকল মহলের অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততার কারণেই অক্টোবরের নির্বাচন পূর্ব ও পরের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যে বিষবাষ্প সারা জাতিকে গ্রাস করে অতল অন্ধকারের গুহায় নিমজ্জিত করেছিল- তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কিংবা তৎপরতা দেখা যায়নি। অধিকন্তু, রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চেহারাকে লুকাবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলোও এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারতো। বসনিয়া-কসবোর মতো নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা এদেশে ঘটে যাবার পরও কেবল তৈল, গ্যাস ও প্রাইভেট পোর্টের স্বার্থরক্ষায় তাদের এহেন নীরবতা অনেককেই বিস্মিত করেছে। ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, জামায়াতে ইসলামী ও হরকাতুল জেহাদের মতো ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন ক্ষমতাসীন বি.এন.পি জোট সরকার কর্তৃক ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হংকং ভিত্তিক ফার ইষ্টার্ণ ইকোনমিক রিভিও - "Beware of Bangladesh"! ক্যাপসনে সে সময়কার (৪ মার্চ, ২০০২) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

সংখ্যালঘূ নির্যাতনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে মৌলিক মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছে। দেশের সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণ তাদের এই ক্ষমতা ব্যবহার করে ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এছাড়াও সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে - জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। পাশাপাশি সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ নির্বাচন এলে এদেশের সংখ্যালঘুরা আতংকের বিভীষিকার মধ্যে থাকে। সাম্প্রতিককালে (২০০১) আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া সহিংস ঘটনাগুলো কি প্রমাণ করে না - এদেশের সংখ্যালঘূদের মৌলিক মানবাধিকার বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই? নির্বাচনোত্তর ভোলায় নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের একজন পরেশ চন্দ্র মিস্ত্রির স্ত্রী প্রভা রাণী (৪০) সংবাদ কর্মীদের বলেন,

> "পত্রিকায় কিছু লেখার দরকার নেই, কাউকে বলতে চাই না, আমাদের জীবনে কি ঘটে গেছে। কোন বিচার চাই না, ক্ষতিপূরণ চাই না। আপনারা শুধু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বলবেন - আমাদের কোন উপায় নেই, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমরা এদেশে থাকতে চাই। শুধু তিনি যেন আমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেন, আমরা একটু শান্তি চাই। তাঁকে বলবেন, মা-মেয়ে যেন আমরা নিরাপদে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। আমরা রাজনীতি করিনা, ভোট দিতে যাইনি। ভবিষ্যতেও কোন দিন ভোট দেবো না। আপনাদের মাধ্যমে তাঁকে কথা দিলাম। তিনি যেন শুধু আমাদের দিকে একটু করুণা করেন। আমরা এদেশেরই মানুষ। আর কতকাল নিজের দেশে পরবাসী থাকবো ? এতো অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য হয় না। না পারি কাউকে বলতে, না পারি দেখাতে। শুধু ঈশ্বর জানেন আমরা কেমন আছি। স্বামী-সন্তান (ছেলে) কে কোথায় আছে জানি না। তারা আর কোন দিন ফিরে আসতে পারবে কি না তাও জানি না। আর কতকাল এভাবে থাকতে হবে? খালেদা জিয়াকে বলবেন আমাদের কথা (সংবাদ, ২০০১)।"

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এই দৈত্য নৃত্যের উম্মাদনায় দেশের এক শ্রেণীর নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার কত যে বিপন্ন তা আর বেশি প্রকাশের প্রয়োজন আছে কি? জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর এক নিবন্ধে (সংবাদ, ১২ অক্টোবর ২০০১) বলেছেন, "এই সহিংসতার শিকার শুধু অসহায় নিরপরাধ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়- এর শিকার বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সৃষ্টি। এ আঘাত আমাদের সকলের উপর। বিপন্ন শুধু একটি সম্প্রদায় নয়- বিপন্ন আমাদের জাতীয় মর্যাদা, আমাদের জাতিসত্তা। হত্যা, নির্যাতন- নিপীড়নের এই 'ব্লু প্রিন্ট' দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রেরই ধারাবাহিকতা। দেশকে মুক্তিযোদ্ধা শুন্য করা এ পরিকল্পনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। একাত্তরের পাকিস্তানী কায়দায় কুন্ডেশ্বরীর নতুন চন্দ্র সিংহকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ঠিক একই কায়দায় মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে নিজ গৃহে নৃশংসভাবে হত্যা করলো (১৬ নভেম্বর, ২০০১) জোট সরকারের আশ্রিত সন্ত্রাসীরা। ঘটনাটি কতটুকু সত্য তা যাচাই করতে গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর বাসভবনে গেলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (তিনি সেদিন চট্টগ্রামে সরকারী সফরে ছিলেন)- যিনি এতদিন সব হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণকে "কাল্পনিক", "সাজানো নাটক"- এমনকি সংবাদপত্রের 'অতিরঞ্জন' বলে চালিয়ে আসছিলেন। গোপাল মুহুরীর ভয়ার্ত লাশ দেখে (পরের দিন প্রায় সবকটি স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে) ধূর্ত মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ)

লুৎফুন নাহার বেগম et.al.: উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ ঃ বাংলাদেশের ২০০১ জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু ৭৫

আলতাফ হোসেন উমা মুহুরীর (গোপাল মুহুরীর স্ত্রী) কাছে চাদর/কাপড় চাইলেন - লাশটি ঢেকে দেওয়া জন্যে। উমা মুহুরী সম্বিত ফিরে পেলেন এবং মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললেন,

> "কাপড় দিয়ে বিভৎসতা ঢাকার দরকার নেই, আপনাদের সরকারের আমলে জনগণের নিরাপত্তা যতটুকু আছে, দেশবাসী দেখুক" (দৈনিক সংবাদ, ১৭ নভেম্বর ২০০১)।

উমা মুহুরী ঠিক কাজটিই করেছেন, বিপদে জ্ঞান হারান নি। এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী শ্রী বিনোদ বিহারীর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। যে কাজটি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা (মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের কথা বাদই দিলাম, যেহেতু অধিকাংশ নেতা-কর্মী নির্বাচনোত্তর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কারণে ঘরছাড়া এবং ফলাফল বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত) করতে পারেনি, সে কাজটিই করে দেখালেন প্রায় শতায়ূ বয়সী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এই নেতা। ঘটনার দিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মুহুরীর বাসভবন পরিদর্শনের সময় উপস্থিত থেকে তিনি মন্ত্রীকে বললেন,

> "আপনি দেশের সাম্প্রদায়িক তান্ডবের ঘটনাগুলো সংসদে অস্বীকার করেছেন। মিরেরসরাইয়ের দাশ পাড়ায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক তান্ডবকে সংসদে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন - 'মুরগী চুরির' ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাশ পাড়ায় ঘটনাটি ঘটেছে। — এই ঘটনাটিও মুরগী চুরির ঘটনার মতো হবে কিনা জানি না। আমরাও সংসদ সদস্য ছিলাম। সংসদে অসত্য কথা বলা অন্যায় বলে জানি" (একই তথ্য সূত্র)।

অনেকেই অক্টোবর দু'হাজার এক সালের নির্বাচনকে গণতন্ত্র উত্তরণের আরো একটি ধাপ অতিক্রম বলে মনে করে থাকেন। এ দাবির ন্যায্যতা নিয়ে আমাদের কোন বিতর্ক নেই। এ হিসাব-কিতাব নিতান্তই যান্ত্রিক (সংখ্যাতাত্বিক) একটি ব্যাপার। আমাদের কাছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশে এর প্রভাব একান্তই হাস্যকর বলে মনে হয়। আমাদের নির্বাচন পদ্ধতিই এসবের প্রমাণ দেয়। এই প্রসঙ্গে হারুন হাবিব (যুগান্তর, ২০০১) যথার্থই বলেছেন, "আমাদের জাতিসত্তার অন্তর্গত বোধ ও পরিচয় আমাদের কখনোই এতটা নিচু করে তোলেনি - যতটা করেছে সাম্প্রতিক এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে"। আর এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতির মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক ও মৌলবাদী অপশক্তি একটি সরকারে যোগ দেয়ার সাফল্য অর্জন করেছে। কত দূর্ভাগা এ জাতি। যে ব্যক্তি ছিল কুখ্যাত আলবদর বাহিনীর প্রধান (গাফফার চৌধুরীর ভাষায় মইত্যা রাজাকার) - সে আজ বি.এন.পি- জোট সরকারের একজন মন্ত্রী! নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটি এক অভূতপূর্ব তাৎপর্যময় ঘটনা, যার প্রতিক্রিয়া সমাজে হতে বাধ্য, এবং ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। সময়ই বলে দেবে আমরা কি ধর্মীয় মৌলবাদী আর জাতীয় স্বাধীনতার সক্রিয় বিরোধীদের নিয়ে 'ওয়ান নেশন' গড়বো (পূর্বোক্ত) নাকি ধর্মীয় সহনশীলতা আর স্বাধীনতার স্বপক্ষের গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্র করে গড়ে তুলবো এই প্রিয় স্বদেশভূমির ভবিষ্যৎ। দেশের বৃহত্তর মানুষ যা চায় জাতির আগামী রাজনীতি নিশ্চয়ই সেভাবেই অগ্রসর হবে। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষোভ হয়তো খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়।

ইসলাম পছন্দ তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার যে সাম্প্রদায়িকতার নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে- এতে মনে হয় এদেশে অচিরেই পাকিস্তানী শাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এ আশঙ্কা যদি সত্যি হয় - তাহলে সাম্প্রদায়িক কলুষ বিস্তারের সহিংস রাজনীতি ও বিকৃত দর্শন চিন্তা পাকিস্তানী সমাজকে কলুষিত করে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যেভাবে অস্থিতিশীল করে তুলেছে- বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রকেও সেই ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে - আমাদের বি.এন.পি-জামাত জোটের রাজনীতি সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িকতার রাষ্ট্রীয় মূল্য ও রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা

সাম্পদায়িকতা আমাদের অস্থি-মজ্জায়-রক্তে মিশে আছে। এ কারণেই এটা সহজে বিলুপ্ত হয় না। রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ না হলে এটির বিনাশ হবে - এমন আশা করারও তেমন কারণ নেই। সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়া কেবল বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর প্রভাব-পাশবিকতা সমাজ- রাষ্ট্রকেও গ্রাস করে। ভারতের কথা যদি বলি- সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন গান্ধীজী, শ্রীমতি ইন্দরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী। পাকিস্তান কি ভালো আছে? সিন্ধু প্রদেশের অতি নগন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা বাদ দিলে গোটা পাকিস্তানে আর কতইবা সংখ্যালঘু আছে। অথচ আফগান তালেবানীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে এদেশটির কিনা বেহাল অবস্থা এখন। দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকার কথা যদি বলি - চন্দ্রিকা কি পেরেছেন সেখানকার জাতিগত সমস্যার সমাধান করতে, তামিলদের শাসন করতে? বরং তামিলদের প্রতিহিংসায় নিহত হলেন বন্দনায়েকে আর প্রেমদাসা। আমাদের পার্বত্য-চট্টগ্রামে জাতিগত পাহাড়ী সমস্যার কথাও ভেবে দেখা দরকার। শক্তি দিয়ে, হিংসা দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, জুলুম-নির্যাতন করে কোন জাতিগত সাম্প্রদায়িক সমস্যা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে না। বলপ্রয়োগে সাময়িকভাবে কারো লাভ হয় কিনা জানি না, তবে এর অনিবার্য ক্ষতি প্রশ্নাতীত। এ ক্ষতির মাশুল একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছাড়িয়ে গোটা জাতিকে গ্রাস করে- মননে, চিন্তায়, স্বাধীনতায়, সত্তায়, এমনকি মূল্যবোধে। ফলে যে রাষ্ট্রশক্তি একদিন এই দানবকে উৎসাহিত করে - সে রাষ্ট্রের সমাজ-নাগরিককে এর চরম মূল্য দিতে হয় এবং এক সময় এর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকারের উপায় চিন্তা খুঁজে বের করাও বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক পাকিস্তান ও আফগানিস্থান এর দৃষ্টান্ত মাত্র।

সামগ্রিক ঐতিহাসিক বিবেচনায় সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিৎ। আবুল মোমেন তাঁর এক নিবন্ধে (প্রথম আলো, ২০০১) আমাদের দেশে মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকাকে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পচাঁত্তরের পর থেকে ১৯৯৬-২০০১ এই পাঁচ বছর বাদ দিলে পরবর্তী বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শাসনকাল ব্যতিত প্রতিটি সরকারই ছিলো কার্যত সাম্প্রদায়িক। ক্ষমতায় থেকে এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৌলবাদী-সাম্পদ্রায়িক দলগুলোকে কেবল পৃষ্ঠপোষকতা করে ক্ষান্ত হয় নি, কোনো সময় (বিশেষ করে নব্বইয়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট) উস্কানিও দিয়েছে সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের। এই সাম্প্রদায়িক মোর্চা জোটভূক্ত হয়ে ২০০১-এ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে। সেকারণেই তখনকার সাম্প্রদায়িক নির্যাতন অতীতের সকল মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে - সারা দেশে যখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঝান্ডা হাতে নিয়ে জোট সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিতাড়নের মহাযজ্ঞে মেতে উঠেছে- তখনো সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন সংখ্যালঘুদের উপর হামলার খবর (যে সমস্ত সচিত্র প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে) সবকিছুই বানোয়াট এবং অতিরঞ্জিত। তাঁর এই বক্তব্য সন্ত্রাসকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমর্থনের শামিল। এতে প্রকারান্তরে সন্ত্রাসীরাই উৎসাহিত হয়। এভাবেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যাঁতাকলে নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতন অতীত ও সাম্প্রতিককালের সকল ভয়াবহতাকে অতিক্রম করেছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জন জরুরী

ভারতে এক সময় মুসলমানরা কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টকে নির্বাচনে বিশেষ সমর্থন করতো। এর কারণ - প্রায়ই কংগ্রেস (কেন্দ্রীয়ভাবে) এবং কখনো কখনো বামফ্রন্ট (স্থানীয়ভাবে) ভারতীয় মুসলমানদের

লুৎফুন নাহার বেগম et.al.: উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ ঃ বাংলাদেশের ২০০১ জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু ৭৭

আস্থাভাজন ছিল। এটা নিছক মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ -সংরক্ষণের বিষয়ে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের উপর আস্থা সৃষ্টির ব্যাপার বলা চলে। এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী তাঁর এক প্রবন্ধে ক্ষমতাসীন বিজেপির প্রসঙ্গ এনে বলেন (ভোরের কাগজ, ২০০১) রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বিজেপি ভারতের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বদলে ফেলার ক্ষেত্রে বড় ধরণের চেষ্টা করেনি। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিজেপির প্রতি আস্থা ফিরে আসতে শুরু করেছে। অথচ আমাদের দেশে বি.এন.পি দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির কোন কাজ না করে শুধু আওয়ামী লীগের 'ভোট ব্যাংক' বলে চিহ্নিত করেছে এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দলীয় ক্যাডার ও সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ত্রাসের রাজত্ব কায়েমে মেতে উঠেছে।

নিজের পছন্দ মতো ভোট দিয়ে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে দুনিয়ায় আর কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে জানা নেই। বিভিন্ন সময়ে ভারতের মুসলমানরা জাতীয়ভাবে কংগ্রেসকে সমর্থন এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টকে সমর্থন দেওয়ায় সেখানকার মুসলিম সংখ্যালঘুরা কি ধর্ষণ-নির্যাতনের শিকার হয়েছে? না, হয় নি। তাহলে এদেশে এর ব্যতিক্রম হয় কেন ? আবেদ খান (জনকণ্ঠ, ২০০১) লিখেছেন, 'সাতচল্লিশে যারা মাটি কামড়ে পড়ে ছিলো, একাত্তরে যারা গিয়েও ফেরত এসেছিলো স্বাধীনতার পর, নব্বইয়ের দাঙ্গা যাদের ভিটেচ্যুত করেনি, এবার দু'হাজার এক সালের অক্টোবরে তারা বিচলিত হয়ে পড়েছে। এদেশ যে তাদেরকে নিরাপত্তা দেবে এমন ভরসা করতে পারছে না তারা'। আমাদের মনে হয় এটা কেবল নিরাপত্তার সংকট নয়। এ সংকট আব্রুর-ইজ্জতের, মূল্যবোধের। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন তো নতুন নয়। কিন্তু অত্যাচারের একটা সীমা তো থাকা উচিত। নিজের চোখের সামনে যদি কেউ মা, বোন, স্ত্রীকে ধর্ষিত হতে দেখে- তাহলে কি দেশ ত্যাগের মতো নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত না নিয়ে কোন উপায় থাকে?

উপসংহার

পঞ্চাশের দশকে জামায়াত নেতা মাওলানা মওদুদীর এক ফতোয়াকে ভিত্তি করে লাহোরসহ পাঞ্জাবে কাদিয়ানী বিরোধী যে দাঙ্গা শুরু হয় - তাতে প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী নিহত হয়েছিলো এবং পাকিস্তানের উচ্চ আদালত এ হত্যাকান্ডের জন্য মওদুদীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ডাদেশ দিয়েছিল। সৌদি আরবের বাদশাহর হস্তক্ষেপে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান মওদুদীর প্রাণ দন্ডাদেশ মওকুফ করেছিলেন। বাংলাদেশে অক্টোবর ২০০১ নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় আদালতে মামলা হয়েছে (মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক)। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ঘটনায় তদন্ত রিপোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশে সরকার আদালতে জমা দিয়েছে। গত ৫ আগষ্ট ২০০২ তারিখে প্রায় সাড়ে তিনশত রিপোর্ট সরকারের পক্ষে এটর্নি জেনারেল অফিস থেকে আদালতে দাখিল করা হয়েছে (ভোরের কাগজ, ১৭ আগষ্ট ২০০২)। সংবাদ মাধ্যমে জানা গেছে, রিপোর্টগুলো পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আনা হয়েছে (যার স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দেহ থাকার যথেষ্ট কারণ আছে)। বেশিরভাগ রিপোর্টেই সংঘটিত ঘটনাগুলোকে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক না বলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে! জানি না মহামান্য আদালত এই জনগুরুত্বসম্পন্ন মামলাগুলোর ভাগ্য নির্ধারণে পাকিস্তানের উচ্চ আদালতের দৃষ্টান্তমূলক রায়টি বিবেচনায় আনবেন কিনা।

যদিও ইতিহাস অনেকেই মনে রাখে না। ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষাও নিতে চায় না। তারপরও ইতিহাস তার আপন গতিতে চলে এবং সাক্ষ্য দেয়। '৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ নিশ্চিহ্ন হয়েছে পঞ্চাশের দাঙ্গার কারণে। '৬৪ সালের দাঙ্গা বাঙ্গালী রুখে দিয়েছে। একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে এদেশের জনগণ ধর্মীয় রাষ্ট্রের মদদপুষ্ট পাক-বাহিনীর অত্যাচারের সমুচিত জবাব দিয়েছে। '৯০ এর স্বৈরশাসক কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংস করার কুটচাল সামাজিক প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। '৯২ সনে ভারতের বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় এদেশে রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার সুযোগে ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান-মাল ও মন্দির-উপাসনালয়ের যে অমানবিক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার মাশুলও দিতে হয়েছে তখনকার ক্ষমতাসীনদের। তাহলে ২০০১-এ কেন আমরা পরাজিত হলাম? না, ঠিক পরাজয় নয়। এটি একটি সংঘবদ্ধ নীল নকশা মোকাবেলার ব্যর্থতা। এতদসত্বেও আমাদের বিশ্বাস- একাত্তরে ধর্মান্ধ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে যে জাতিসত্তার নবজাগরণ ঘটেছিলো, সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের তীব্রতা আমাদের সেই পূনর্জাগরণের প্রেরণা দেবে নিশ্চয়ই। জয় হবে অসাম্প্রদায়িক চেতনার, মানবতার। দেশ-বরেণ্য জাতীয় কবি শামসুর রহমানের- "কৃষ্ণ পক্ষের গভীর অমানিশার তমশাচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে নতুন দিগন্তের উষালগ্ন প্রতিভাত হবেই"। অপেক্ষা শুধু সময়ের।

তথ্যসূত্র

১. "সাম্প্রদায়িক ও অভিশপ্ত জাতি হতে চাই", উপসম্পাদকীয়, দৈনিক যুগান্তর, ১৯ অক্টোবর, ঢাকা আহমেদ, ফয়েজ ২০০১।

২. "গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিফলন-একটি গভীরতর বিশ্লেষণ", **প্রান্তজন** মানবাধিকার বিষয়ক জার্নাল, সংখ্যা ২, জুলাই, পৃ: ১৬০। উর্মি, সুরাইয়া বেগম, ২০০২

৩. "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙ্গালি সমাজ", আমজাদ হোসেন রচিত-**উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি গ্রন্থ** (পড়ুয়া প্রকাশনী) থেকে উদ্বৃত, পৃ; ৪১। ত্রিপাঠি, অমলেশ

৪. **দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদ ঃ** প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, অনন্যা (প্রকাশক), বাংলা বাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, পৃ: ৯।কবির, শাহরিয়ার, ২০০১

৫. "সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হলে এ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে কি"?, উপসম্পাকীয়, দৈনিক সংবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর, ঢাকা। কার্জন, হাফিজুর রহমান, ২০০১

৬. "শুরুতেই সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিদের উপর আক্রমণ কিসের ইঙ্গিত বহন করছে?", উপসম্পাদকীয়, দৈনিক ভোরের কাগজ, ২২ অক্টোবর, ঢাকা। খান, আবু তাহের, ২০০১

৭. "বাংলাদেশ কি 'হিন্দু শুন্য' করা হবে?", উপসম্পাদকীয়, দৈনিক যুগান্তর, ১২ নভেম্বর, ঢাকা।চৌধুরী, আব্দুল গাফফার, ২০০১

৮. "বাংলাদেশে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতনঃ উত্তরণ কোন পথে", **নির্যাতিত সংখ্যালঘু- বিপন্ন জাতি**-গ্রন্থে প্রকাশিত (সম্পাদনা পরিষদ), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম, জানুয়ারী, পৃ; ১৭৫। দে, রনজিত কুমার , ২০০২

৯. **"উপমহাদেশে সংখ্যালঘু বিপন্নতা: উত্তরণ কোন পথে"**, সেমিনার প্রবন্ধ (এন ডি), চট্টগ্রাম। দাশগুপ্ত, অরুণ, ২০০২

১০. "ভোট, গণতন্ত্র ও মানবতা", উপসম্পাদকীয়, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর, ঢাকা। পাটোয়ারী, মমতাজউদ্দীন, ২০০১

১১. "এই সহিংসতা কি সাম্প্রদায়িক প্রচারণার ফল নয়?", উপসম্পাদকীয়, দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর, ঢাকা। মোমেন, আবুল, ২০০১

১২. "রাজনীতির মাঠ", সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা। "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে", উপসম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, ১৫ অক্টোবর, ঢাকা। পারভেজ, আলতাফ, ১৯৯১

১৩. "এ আঘাত আমাদের জাতিসত্তার উপর", উপসম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, ১২ অক্টোবর, ঢাকা। সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান, ২০০১

১৪. "আকাশ প্রমাণ তরঙ্গ তুলে গর্জে উঠুক মানুষ", উপসম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, ১৩ অক্টোবর, ঢাকা। হক, হাসান আজিজুল, ২০০১

১৫. "যে হও বাঙ্গালী তুমি রুখিয়া দাঁড়াওড়ড়", উপসম্পাদকীয়, দৈনিক যুগান্তর, ৮ নভেম্বর, ঢাকা। হাবিব, হারুন, ২০০১

১৬. মানবতার বিরূদ্ধে অপরাধ-ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ডকুমেন্টেশন উপকমিটি (প্রকাশক), ফেব্রুয়ারী, ঢাকা, পৃ; ৪০০। মানবতার বিরূদ্ধে অপরাধ: জাতীয় কনভেনশন ২০০২

১৭. ফেমা'র প্রতিবেদন, ২০ অক্টোবর, ঢাকা। দৈনিক সংবাদ, ২০০১

১৮. এমএইএম এর প্রতিবেদন, ২০ অক্টোবর, ঢাকা। দৈনিক প্রথম আলো, ২০০১

১৯. 'ভোট' এর রিপোর্ট, ২১ অক্টোবর, ঢাকা। দৈনিক সংবাদ, ২০০১

২০. অধ্যক্ষ গোপাল মুহুরীর স্ত্রী উমা মুহুরীর মন্তব্য, এবং শ্রী বিনোদ বিহারীর বক্তব্য ১৭ নভেম্বর, ঢাকা। দৈনিক সংবাদ, ২০০১

২১. ভোলার পরেশ চন্দ্র মিস্ত্রির স্ত্রী প্রভা রাণীর বক্তব্য, ২৩ অক্টোবর, ঢাকা। দৈনক সংবাদ, ২০০

২২. ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত সাতটি দেশের কুটনীতিকদের উদ্বেগ, ১৯ অক্টোবর, ঢাকা। দৈনিক যুগান্তর, ২০০১

২৩. পাকিস্তানের 'মুখতারান বিবির' নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্য (এনামুল হক কর্তৃক লিখিত উপসম্পাদকীয়-'এ কোন অন্ধকার সমাজ') ২১ জুলাই, ঢাকা। দৈনিক জনকণ্ঠ ২০০২

২৪. সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কিত সরকারের রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দান, ১৭ আগষ্ট, ঢাকা। দৈনিক ভোরের কাগজ, ২০০২